বেদ
(The Vedas)

হিন্দুদের মূল শাস্ত্র বেদ। বেদ-কে ভিত্তি করেই ভারতীয় দর্শনচিন্তার উদ্ভব। প্রাচীনতম ভারতীয় শাস্ত্র বেদের ভাষা সংস্কৃত। হিন্দুধর্ম ও দর্শনচিন্তার সমস্ত বিষয়ের সর্বোচ্চ প্রামাণ্য বেদ নির্ভর। "বেদই ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি বোধের মূল ভিত্তি।" প্রাচীনকালে বেদ এত পবিত্র বলে পরিগণিত হত যে বেদকে লেখার চিন্তা করা পবিত্র বস্তুকে অপবিত্রকরণ বলে মনে করা হত। তখন গুরুর মুখ হতে শুনে শুনে শিষ্যেরা বেদবিদ্যা লাভ করত। তাই বেদের অপর নাম শ্রুতি। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, বেদ কোন মানুষের রচনা নয়। ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি ঈশ্বরবাদী দার্শনিকদের মতে, বেদ ঈশ্বরের বাণী; ঈশ্বর বেদের রচয়িতা। তাঁদের মতে বেদ অনিত্য। মীমাংসা প্রভৃতি নিরীশ্বরবাদীদের মতে, বেদ নিত্য, অনাদি, অনন্ত ও অপৌরুষেয়। বৈদিক আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাশি অনন্তকাল ধরে রয়েছে, তা অনাদি, অনন্ত। বেদের কোন রচয়িতা নাই। 'বেদ' শব্দের মুখ্য অর্থ 'জ্ঞান', 'অতীন্দ্রিয় প্রজ্ঞা'। গৌণ অর্থে 'বেদ' বলতে সেই শব্দসমূহকে (words) বোঝায়, যাতে এই অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিধৃত হয়ে আছে। সুতরাং বেদ বলতে কেবল ভারতের ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রজ্ঞাকেই বোঝায় না, কিন্তু সেই গ্রন্থসমূহকেও বোঝায়, যাতে এই প্রজ্ঞার প্রাচীনতম উক্তিসমূহ বিধৃত হয়ে আছে। হিন্দুগণ বেদকে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন। বেদসমূহ শব্দব্রহ্ম (Word Brahman) বলে পরিচিত।[২] 'সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল শুধু শব্দ এবং শব্দ ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ছিল—এ তত্ত্ব ভারতবর্ষের প্রাচীন তত্ত্ব'।*

বিষয়বস্তু অনুযায়ী বেদ দুভাগে বিভক্ত; কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বেদের কর্মকাণ্ডে কর্ম, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি আলোচিত যার লক্ষ্য ইহলোকে পার্থিব উন্নতিলাভ এবং মৃত্যুর

---

২. The Upanishads (tr.), Swami Nikhilananda; Bonanza Books, New York, Vol. I, p. 1; ব্রহ্মসূত্র (অনু., ইং), স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, অনু., বাংলা, ড. সচ্চিদানন্দ ধর, উদ্বোধন, ১৯৯৮, পৃঃ ১।

* স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ১০ম খণ্ড, উদ্বোধন, কলকাতা, ২০০৮, পৃঃ ২৭০।

পর স্বর্গপ্রাপ্তি। জ্ঞানকাণ্ড সেই জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে যার দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হয় এবং পরম পুরুষার্থ মুক্তিলাভ হয়। বেদব্যাস বেদকে চারভাগে ভাগ করেন; ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। প্রত্যেকটি বেদের দুটি অংশ আছে। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। মন্ত্রকে 'সংহিতা' বলা হয়, যার অর্থ হল যজ্ঞে ব্যবহৃত মন্ত্র সমষ্টি। দেবতাদের উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতিকে বলা হয় যজ্ঞ। বেদের মন্ত্র অংশে রয়েছে বিভিন্ন প্রার্থনা ও মন্ত্র, ব্রাহ্মণ অংশে যজ্ঞের বিধি-নিয়ম পাওয়া যায় এবং এই অংশে মন্ত্রের অর্থ ব্যক্ত হয়েছে। মন্ত্র হল কোন দেবদেবীর উদ্দেশে উচ্চারিত স্তব বা স্তোত্র। প্রাচীনকালে ঋষিরা প্রকৃতির যেখানে শক্তি ও সৌন্দর্যের উৎস আবিষ্কার করেছেন তার উপরই দেবত্ব আরোপ করে স্তোত্র রচনা করেছেন, যাকে সূক্ত বলা হয়। এভাবে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, ঊষা, বরুণ, দৌ দেবত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। বৈদিক যজ্ঞ উপাসনার রীতিবিশেষ। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগকে যজ্ঞ বলা হয়। যিনি দ্রব্য ত্যাগ করেন তিনি যজমান। অর্থাৎ যজমানকে যজ্ঞের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি, যেমন—সমিধ বা কাষ্ঠ, ঘৃত, সোমরস প্রভৃতি সরবরাহ করতে হত। যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীকে ঋত্বিক বলা হত। এই ঋত্বিকদের শ্রেণীবিভাগ ছিল। যিনি সমগ্র যজ্ঞকর্মের পরিচালনা করতেন তাঁকে ব্রহ্মা, যিনি সূক্ত পাঠ করতেন, তাঁকে হোতা, সূক্ত গান করে যিনি পাঠ করতেন, তাঁকে উদগাতা, অগ্নিতে আহুতি যিনি দিতেন তাঁকে অধ্বর্যু বলা হত।

মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণকে বেদ বলা হয়েছে। ('মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্'—আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র—২৪/১/৩১৬)। কখনও কখনও অথর্ব বেদকে বাদ দিয়ে বেদকে 'ত্রয়ী' বলা হয়েছে। ঋক্-এর অর্থ হল কবিতার স্তবক, সাম-এর অর্থ গান, যজুঃ-র অর্থ হল গদ্যে লিখিত অংশ। বৈদিক ঋষি বেদের রচয়িতা নন, কিন্তু তাঁরা মন্ত্রের দ্রষ্টা ('ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ')। অর্থাৎ তাঁরা তত্ত্বদ্রষ্টা, সত্যদ্রষ্টা। তাঁদের হৃদয়ে বেদমন্ত্র স্বতঃই প্রকাশিত হয়েছিল। ঋষিগণ পূর্ব হতে বিদ্যমান ভাবরাশির দ্রষ্টামাত্র। তাঁরা উক্ত জ্ঞানরাশির আবিষ্কর্তা মাত্র। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে বৈদিক যাগযজ্ঞ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। ব্রাহ্মণ অংশে বিশেষ দর্শনচিন্তার প্রকাশ দেখা যায় না। আরণ্যক-এ, যাকে ব্রাহ্মণ অংশের উপাঙ্গ বলা যায়, যাজ্ঞিক ক্রিয়াকাণ্ড থেকে দার্শনিক চিন্তার দিকে সংক্রমণ লক্ষ করা যায়। বেদের আরণ্যক অংশ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যবর্তী। এই অংশে বৈদিক যজ্ঞের অলৌকিক (mystic) ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আরণ্যকের শেষভাগ হল উপনিষদ। এগুলি গভীর দার্শনিক চিন্তায় পরিপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিক। এগুলিকে বৈদিক দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ বলা যায়। উপনিষদকে 'বেদান্ত'ও বলা হয়, কারণ উপনিষদ বেদের অন্ত বা শেষ এবং উপনিষদে বৈদিক প্রজ্ঞার পরিণতি (অন্ত) লক্ষ করা যায়।

বেদসমূহের সঠিক কাল নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। ইউরোপীয় ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্সমুলার-এর মতে বেদের আনুমানিক কাল হল ১২০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ। প্রখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলকের মতে আনুমানিক ৪৫০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সংকলিত হয়। কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিতের মতে বৈদিক মন্ত্রগুলির কাল আনুমানিক ৩০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ, অন্যদের মতে ৬০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ। অধ্যাপক জাকবির (Jacobi) মতে বৈদিক মন্ত্রগুলির কাল আনুমানিক ৪০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ। রাধাকৃষ্ণন-এর মতে মন্ত্রগুলির আনুমানিক কাল ১৫০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ। ছান্দোগ্য উপনিষদে মহাভারতের অন্যতম নায়ক কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল খ্রিঃ পূঃ দশম শতাব্দী। তাহলে বলা যায় প্রাচীন উপনিষদগুলি এর সমসাময়িক। সুতরাং সিদ্ধান্ত করতে হয়, ব্রাহ্মণ অংশ তার আগে রচিত এবং ঋগ্বেদ সংহিতা তারও আগে। সুতরাং বলা যায়—ঋগ্বেদের রচনাকাল আনুমানিক ১২০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ।

সংক্ষেপে বলা যায় বৈদিক মন্ত্র এবং সংহিতার সঠিক কাল নির্ণয় করা কঠিন। অনেক ইউরোপীয় ভারততত্ত্ববিদের মতে উপনিষদগুলির রচনাকাল বেদের মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ অংশের পরে। তাঁদের মতে উপনিষদগুলি ১১০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দের পূর্ববর্তী নয়। কিন্তু হিন্দুদের মত এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁদের মতে, বেদের সব অংশই একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল (revealed), যদিও বিভিন্ন সংকলন বিভিন্ন সময়ে সংকলিত হয়েছিল।[৩]

প্রাক্-উপনিষদীয় বৈদিক চিন্তা
(Pre-Upanisadic Vedic Thought)

প্রাক্-উপনিষদীয় বৈদিক চিন্তায় যজ্ঞের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে বেদ বলা হয়েছে। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে বৈদিক যাগযজ্ঞ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। দেবতাদের উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতিকে বলা হয় যজ্ঞ। বেদের মন্ত্র অংশে রয়েছে বিভিন্ন প্রার্থনা ও মন্ত্র। ব্রাহ্মণ অংশে যজ্ঞের বিধি-নিয়ম পাওয়া যায় এবং এই অংশে মন্ত্রের অর্থ ব্যক্ত হয়েছে। মন্ত্র হল কোন দেবদেবীর উদ্দেশে উচ্চারিত স্তব বা স্তোত্র। প্রাচীনকালে আর্যঋষিগণ যেখানে শক্তি ও সৌন্দর্যের উৎস আবিষ্কার করেছেন তার উপরই দেবত্ব আরোপ করে স্তোত্র রচনা করেছেন, যাকে সূক্ত বলা হয়। "এইভাবে পৃথিবীতে অবস্থিত দেবতারূপে, অগ্নি, অপ্ ও পৃথিবী দেবতারূপে কল্পিত হয়েছেন, ইন্দ্র, মরুৎ, পর্জন্য অন্তরীক্ষের দেবতারূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং সূর্য, বরুণ, ঊষা, রাত্রি

৩. 'ঋগ্বেদ পরিচয়', হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম খণ্ড), হরফ, কলকাতা, ২য় সং, ১৯৮৭, পৃঃ ২০-২১, ৩৩-৩৫।

প্রভৃতি দ্যুলোকের দেবতারূপে পরিগণিত হয়েছেন। এঁরা সকলেই এক একটি প্রাকৃতিক শক্তি।"* ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে অগ্নি, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের প্রশংসা দেখা যায়। বেদের এই চিন্তাকে বহুদেবতাবাদ (Polytheism) বলা যায়।

কিন্তু বহু দেবতায় বিশ্বাস, যা প্রাচীন বৈদিক ধর্মের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, ক্রমেই গুরুত্ব হারায়। বৈদিক ঋষিগণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সরলতা লাভের উদ্দেশ্যে বিশ্বজাগতিক ঘটনাবলীর কারণসমূহ অন্বেষণের চেয়ে সেগুলির চরম বা আদিকারণ (Ultimate or First cause) জানার চেষ্টা শুরু করেন। তাঁরা পর্যবেক্ষিত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার জন্য বহুদেবতার স্বীকৃতির চেয়ে এক ঈশ্বরের আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন, যিনি সবকিছুকে, নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করেন।

দেখা যায়, আর্যঋষিগণ ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতিকে বিভিন্ন দেবতারূপে স্বীকার করছেন, তাঁদের আহুতি দিয়ে স্তুতি করছেন। নাম ছাড়া এক দেবতা প্রায় অন্য দেবতার অনুরূপ। নাম ছাড়া কোন একটি স্তোত্র কোন্ দেবতার স্তুতি তা নিরূপণ করা কঠিন। দেখা যায়, এসময় কখনও অগ্নিকে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করা হচ্ছে; কখনও ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করে তাঁকে সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিদ্যমান এবং সর্বজীবের অন্তর্দ্রষ্টা বলা হচ্ছে। আবার কখনও বরুণ দেবতা সম্পর্কে বলা হচ্ছে—তিনিও ইন্দ্রের মত অন্তরীক্ষের দেবতা, বৃষ্টির অধিপতি, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। এই ধারণাকে অনেকে 'একেশ্বরবাদ' (Monotheism) বলেছেন। "এই একেশ্বরবাদ একেবারে প্রথমদিকে ভারতে দেখা দিয়াছিল, দেখিতে পাই সংহিতার সর্বত্রই—উহার প্রথম ও সর্বপ্রাচীন অংশে এই একেশ্বরবাদের প্রভাব।"[৪]

ঋগ্বেদের ঋষিগণ বহুদেবতার মধ্যে বৃহত্তম শক্তির সন্ধান মেলে না বলে বহু দেবতার মধ্যে সর্বোচ্চ (Supreme) দেবতার সন্ধান করলেন। এসব দেবতা একের পর এক গ্রহণের পর এক একজন সর্বোচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং প্রত্যেকে অনাদি অখণ্ড সগুণ ঈশ্বররূপে অভিহিত হয়েছেন। ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্সমুলার ঋগ্বেদের চিন্তার এই বিশেষত্ব দেখে তাকে একেশ্বরবাদ (Monotheism)—যা একমাত্র এক ঈশ্বরে বিশ্বাস (belief in one only God)—থেকে পৃথক করে 'অতিদেবতাবাদ' (Henotheism)— যা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস (belief in one God)—আখ্যা দিয়েছেন।* ম্যাক্সমুলার অতিদেবতাবাদকে বহুদেবতাবাদ থেকে একেশ্বরবাদে যাওয়ার মধ্যবর্তী স্তর বলেছেন।

---

* পূর্ববৎ, পৃঃ ৭৫।

৪. 'বৈদিক ধর্মাদর্শ', স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, উদ্বোধন, ১৯৯৪, পৃঃ ১৫২।

* পূর্ববৎ, পৃঃ ১৫৩।

কিন্তু ম্যাক্সমুলারের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেকের কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি। বহুদেবতাকে এক দেবতায় রূপান্তরিত করার সহজতম উপায় হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতাকে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করা। কিন্তু বৈদিক চিন্তায় সে চেষ্টা করা হয়নি। এটি ঠিক যে, একেশ্বরবাদের এই পথে কখনও বরুণ, কখনও ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত হয়েছেন। কিন্তু বরুণ বা ইন্দ্র কেউ ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর (God conceived as a personality) বলে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হননি। সুতরাং বলা যায়, সাধারণ অর্থে যাকে একেশ্বরবাদ বলা হয় এই প্রাচীন বৈদিক চিন্তাকে তা বলা যায় না। বৈদিক ঋষিগণ দেবতাদের মধ্যে একত্বের সন্ধান করেছেন ভিন্নভাবে। তাঁরা বিভিন্ন দেবতাদের মধ্যে এক সর্বোচ্চ দেবতা আবিষ্কার করতে চাননি। বরং তাঁরা ঐসব দেবতার পরিচালক যে সাধারণ শক্তি (common power) সেটিই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। এই 'দার্শনিক একেশ্বরবাদ' (philosophic monotheism) ঋগ্বেদের প্রাচীন মন্ত্রসমূহে দেখা যায়। আমরা বৈদিক ঋষিগণকে মিত্র এবং বরুণ—এই দুই দেবতাকে এমনভাবে আহ্বান করতে দেখি যেন তাঁরা এক। এই প্রবণতারই প্রকাশ দেখি ঋগ্বেদেঃ "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানম আহু।" "সত্তা এক হলেও পণ্ডিতেরা তাঁকে নানাভাবে বর্ণনা করেন। তাঁকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা বলেন।" অর্থাৎ সমস্ত দেবতা এক সত্তারই বিভিন্ন প্রকাশ। বৈদিক ঋষিগণ নানা প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যারূপে চরম কারণ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত স্বরূপ কি? এই প্রশ্ন তাঁদের সুদীর্ঘকাল বিচলিত করেছিল। তাঁরা একের পর এক সমাধানের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু তাঁরা কোনটিতেই সন্তুষ্ট হন না। ঈশ্বরকে একক শক্তি রূপে ধারণা করার প্রাচীনতম চিন্তা অগ্রসর হয়েছে বিশ্বদেবতার কল্পনা দিয়ে। এরূপ একত্বের ধারণা প্রকৃতির কার্যাবলীর মধ্যে নিহিত উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্যের চেতনার ইঙ্গিত দেয়।

মৌলিক সত্তা সম্বন্ধে চিন্তার একেশ্বরবাদের দিকে প্রবাহিত হবার পরিচয় পাওয়া যায় প্রজাপতি (ঋগ্বেদ ঃ ১০/১২১) এবং বিশ্বকর্মাসূক্তে (ঋগ্বেদ ঃ ১০/৮২)। একেশ্বরবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক, তিনি বিশ্ব হতে পৃথকভাবে অবস্থান করেন এবং ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট। এসময় যেসব দেবতা গুরুত্বলাভ করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন প্রজাপতি, যিনি প্রকৃতির সৃষ্টি শক্তির ব্যক্তিরূপী প্রকাশ। উৎপত্তির দিক থেকে প্রজাপতি ও বিশ্বকর্মার মধ্যে সাদৃশ্য আছে। প্রজাপতি এই নাম সূচিত করে যে, তিনি সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, আমাদের জন্মদাতা পিতা। তিনি বিশ্বের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা। ব্রাহ্মণ অংশে তিনি প্রথম স্থানাধিকারী। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে তেত্রিশজন দেবতা আছেন এবং প্রজাপতি তাঁদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে চৌত্রিশতম।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বৈদিক একেশ্বরবাদী চিন্তায় অদ্বৈতবাদী (monistic) চিন্তা মিশ্রিত ছিল এবং এ দুটিকে পৃথক করা কঠিন।

কিন্তু ঋগ্বেদে কোথাও একটি, কোথাও অপরটির প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং বলা যায়, দুটি প্রবণতাই ছিল। তার মধ্যে একেশ্বরবাদের ধারণা (monotheistic conception) দ্বৈতবাদ সূচিত করে। এর লক্ষ্য বহুদেবতাকে এক দেবতায় রূপান্তরিত করা, যিনি তাঁর সৃষ্ট বিশ্বের অতীত হয়েও তার পরিচালক। এই মতে প্রকৃতি ঈশ্বর থেকে পৃথকভাবে অবস্থিত। তাই এ ধারণা বিশিষ্ট অর্থে একত্ব লাভের ইচ্ছাকে তৃপ্ত করে।

কিন্তু বৈদিক ঋষিগণ এক উচ্চতর একত্বের ধারণা করেছেন যাকে 'অদ্বৈতবাদ' ('monism') বলা যেতে পারে, যা সমস্ত কিছুর উৎসরূপে এক সত্তার অনুসন্ধান করে। এই ধারণাই পূর্ণরূপে আমরা পাই উপনিষদে।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে (১০/৯০) বৈদিক ঋষিগণ সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে যে ঐক্য বর্তমান, তা বলেছেন ঃ পুরুষসূক্তে বলা হয়েছে, 'সহস্র শীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ পুরুষ সর্বত্র বেষ্টন করে আছেন এবং দশ অঙ্গুলি পরিমাণ বিশ্ব অতিক্রম করেও আছেন।' ('সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ। ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্' ১০/৯০/১)। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে বলা হয়েছে ঃ 'বিশ্বজীবসমূহ তাঁর একপাদ (অংশ) মাত্র। আকাশে অমর অংশ তাঁর তিন পাদ' ('পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতংদিবি' ১০/৯০/৩)।

ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে (১০/১২৯/১-৭) এক নৈর্ব্যক্তিক পরমসত্তার (Impersonal Ultimate Reality) কথা বলা হয়েছে, যা বর্ণনার অতীত। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

"ন অসৎ আসীৎ ন সৎ আসীৎ তদানীং ন আসীৎ রজো ন ব্যোমা পরো যৎ।"

"ন মৃত্যুঃ আসীৎ অমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস।।"

"তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম।
তুচ্ছেনাভ্ব পিহিতং যদ আসীৎ তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্।।"

"কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।"

"ইয়ং বিসৃষ্টিঃ যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্য অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।।"

অর্থাৎ "তখন যা নাই, তাও ছিল না, যা আছে, তাও ছিল না।
পৃথিবীও ছিল না, অতিদূর বিস্তার আকাশও ছিল না।"
"তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, দিবারাত্রির বিভাগ ছিল না।

সেই এক অবরুদ্ধ প্রাণে নিজেতেই অবস্থান করছিলেন,
তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।"

"প্রথমে অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার লুকান ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও জলময় ছিল। বিশৃঙ্খলায় আচ্ছাদিত শূন্যতা সেই এক তপস্যার প্রভাবে জন্মিলেন।"

"প্রথমে যা ছিল, তা যেন ইচ্ছারূপে পরিণত হল, তা হতে সর্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হল।"

"এ নানা সৃষ্টি যে কোথা হতে হল, কার থেকে হল, কেউ সৃষ্টি করেছেন, কি করেননি, তা তিনিই জানেন, যিনি এর প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনি নাও জানতে পারেন।"[৫]

ঋগ্বেদের এই নাসদীয় সূক্ত অদ্বৈতবাদী চিন্তার (monistic thought) সারসংক্ষেপ। এখানে বৈদিক চিন্তাবিদ কারণতার নীতিকে স্বীকার করে কেবলমাত্র সমস্ত বিশ্বজগতের একটি উৎসের অনুসন্ধান করেননি, সেই সত্তার স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টাও করেছেন। বিশ্বজগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা বললেন ঃ জগৎ বাইরের কোন কর্তার দ্বারা সৃষ্ট নয়, বরং এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এক অতীন্দ্রিয় আদি কারণের স্বতোপ্রণোদিত অভিব্যক্তি। সর্বেশ্বরবাদের যে ঈশ্বরবাদী দৃষ্টি তা এখানে নাই। নাসদীয় সূক্তে তা 'তদেকম্' (That One) এই দুটি শব্দের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। এই সূক্তে যে নৈর্ব্যক্তিক সত্তার কথা বলা হয়েছে, তাঁকেই পরবর্তীকালে উপনিষদে নির্গুণ ব্রহ্ম বলা হয়েছে।[৬]

উপনিষদ
(The Upanisads)

বেদ ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে বেদ বলা হয়েছে। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে বলা হয়েছে ঃ "মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।" বেদের ব্রাহ্মণ অংশে বৈদিক যাগযজ্ঞ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এই অংশে বিশেষ দর্শনচিন্তার প্রকাশ দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ অংশের উপাঙ্গ আরণ্যকে যাজ্ঞিক ক্রিয়াকাণ্ড থেকে দার্শনিক চিন্তার দিকে সংক্রমণ লক্ষ করা যায়। আরণ্যকের শেষভাগ হল উপনিষদ। বেদের অন্তভাগ বলে উপনিষদকে 'বেদান্ত' বলা হয়। উপনিষদে বৈদিক প্রজ্ঞার পরিণতি (অন্ত) লক্ষ করা যায়। সে কারণেও উপনিষদ 'বেদান্ত' বলে অভিহিত হয়। উপনিষদে বলা হয়েছে—'সমস্ত

---

৫. ঋগ্বেদ সংহিতা (২য় খণ্ড), হরফ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ৬৪০; স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ১৯৯৪, পৃঃ ১৫৬-৫৭।

৬. Outlines of Indian Philosophy, M. Hiriyanna, London, George Allen Q Unwin 1968 (1st pub. 1932), pp. 35-43.

বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও উপনিষদ পাঠ না করলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭/১/২-৩) নারদ সনৎকুমারকে বলেন ঃ "ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ স্থানীয় অথর্ববেদ, ইতিহাস—পুরাণ নামক পঞ্চমবেদ, সমস্তবেদেরও যে বেদ (অর্থাৎ ব্যাকরণ), শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র, শাস্ত্র, দৈব-উৎপাত বিষয়ক বিদ্যা, কালতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প ও দেবজনবিদ্যা, আমি এই সবই জানি। এত জানিয়াও আমি কেবল মন্ত্রবিৎ, আত্মবিৎ নই।"

'উপনিষদ' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে সদ্ ধাতুর সঙ্গে উপ ও নি উপসর্গ যুক্ত করে (উপ + নি + সদ্ + ক্বিপ)। 'সদ' ধাতুর অর্থ নাশ করা (annihilate), আলগা করা (loosen), লাভ করা (attain)। 'উপ' উপসর্গের অর্থ নিকটে এবং 'নি' উপসর্গের অর্থ সম্পূর্ণভাবে। তাই উপনিষদ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—'কোন যোগ্য গুরুর কাছে লব্ধ জ্ঞান বা বিদ্যা যা সম্পূর্ণরূপে জাগতিক বন্ধন নাশ করে,' অথবা 'নিশ্চিতভাবে শিষ্যকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ করে', অথবা 'যা শিষ্যকে গুরুর কাছে নিয়ে যায়', অথবা 'যা সম্পূর্ণভাবে অবিদ্যাকে নাশ করে।'

যদিও উপনিষদ শব্দ মুখ্য অর্থে ব্রহ্মবিদ্যাকে বোঝায় তথাপি গৌণ অর্থে উপনিষদ বলতে সেই গ্রন্থ সমূহকে বোঝায় যাতে সেই বিদ্যা বা জ্ঞান বিধৃত আছে।

ব্রহ্মের গভীর জ্ঞান গভীর রহস্য বলে বিবেচিত হয়। তাই উপনিষদকে 'রহস্যবিদ্যা' বলা হয়। উপনিষদে বেদের রহস্য ব্যক্ত হয়েছে। উপনিষদকে ব্রহ্মবিদ্যাও বলা হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উপনিষদকে বলা হয়েছে 'সত্যস্য সত্যম্' ('the Truth of truth')[৭] মুক্তিক উপনিষদে ১০৮টি উপনিষদ উল্লিখিত হয়েছে। নির্ণয়সাগর প্রেসের সংকলনে বাসুদেবলক্ষ্ণ শাস্ত্রী ১১২টি উপনিষদের উল্লেখ করেছেন। বেদান্তসূত্র-এর শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার অদ্বৈতবেদান্তী শঙ্করাচার্য যে ১১খানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছেন সেগুলি নির্ভরযোগ্য উপনিষদ বলে পরিগণিত হয়। সেগুলি হল—*ঈশ* উপনিষদ, *কঠ* উপনিষদ, *কেন* উপনিষদ, *প্রশ্ন* উপনিষদ, *মুণ্ডক* উপনিষদ, *মাণ্ডুক্য* উপনিষদ, *ঐতরেয়* উপনিষদ, *তৈত্তিরীয়* উপনিষদ, *ছান্দোগ্য* উপনিষদ, *বৃহদারণ্যক* ও *শ্বেতাশ্বতর* উপনিষদ।

অনেক ইউরোপীয় ভারততত্ত্ববিদের মতে উপনিষদগুলির রচনাকাল বেদের মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ অংশের পরে। তাঁদের মতে উপনিষদগুলি ১১০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দের পূর্ববর্তী নয়। কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতদের মত এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। তাঁদের মতে বেদের সব

---

৭. The Upanishads. (Tr.). Swami Nikhilananda. Vol. I. pp. 11-12.

১৮১.৪
নীরদা / বো.৫
ACC NO. 5706
Date 08.08.18
A. M. M. T G. Lib

অংশই একই সময়ে (আনুমানিক ১৫০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ) প্রকাশিত (revealed), যদিও বিভিন্ন সংকলন বিভিন্ন সময়ে সংকলিত হয়েছিল।

উপনিষদসমূহে নানা চিন্তার সমাবেশ লক্ষ করা যায় ঃ দ্বৈতবাদ (Dualism), বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (Qualified Non-dualism) এবং অদ্বৈতবাদ (Monism)। তাছাড়া, উপনিষদে নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে মোক্ষলাভের উপায় হিসাবে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, যোগ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং প্রশ্ন হল—উপনিষদসমূহ কি কতকগুলি অসম্বদ্ধ প্রত্যয়ের সমাবেশ অথবা সেগুলি সুসংগত, সুসম্বদ্ধ একটি জ্ঞানের ভাণ্ডার? হিন্দু চিন্তাবিদদের মতে, উপনিষদসূমহ সুসঙ্গত এবং সেগুলি একটি সত্যের কথা বলে, এক ও অদ্বিতীয় সত্তা ব্রহ্মের কথা বলে। উপনিষদসমূহের শিক্ষাকে সুসম্বদ্ধভাবে প্রকাশ করার জন্য বাদরায়ণ বা ব্যাসদেব *ব্রহ্মসূত্র* গ্রন্থ (আনুমানিক ২০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ) রচনা করেন, যা *বেদান্তসূত্র, শারীরকসূত্র, শারীরকমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা* নামে পরিচিত।

পরবর্তীকালে শঙ্করাচার্য (৭৮৮-৮২০ খ্রিঃ), রামানুজ (১০১৭-১১৩৭ খ্রিঃ), মধ্বাচার্য (১১৯৭ খ্রিঃ), নিম্বার্কাচার্য (১৪০০ খ্রিঃ), বল্লভাচার্য (১৪৭৯ খ্রিঃ), *ব্রহ্মসূত্র* গ্রন্থের ভাষ্য (ব্যাখ্যা) রচনা করেন। শঙ্করাচার্যের মতবাদ 'অদ্বৈতবাদ', রামানুজের মতবাদ 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', মধ্বাচার্যের মতবাদ 'দ্বৈতবাদ', নিম্বার্কাচার্যের মতবাদ 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ', বল্লভাচার্যের মতবাদ 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ', চৈতন্যদেব অনুসারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতবাদ 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' বলে খ্যাত। বেদান্তদর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও তাঁরা সকলেই বাদরায়ণকে অনুসরণ করেছেন বলে দাবি করেন। এসব ভাষ্যকারেরা প্রত্যেকেই মনে করেন যে, একমাত্র তাঁর ব্যাখ্যাই শ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ব্রহ্ম
(The Absolute)

উপনিষদে পরমসত্তার (Ultimate Reality) অনুসন্ধান করা হয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে—আত্মাই চরম সত্তা। এই আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মা, চৈতন্য, ব্রহ্ম অভিন্ন। পরমসত্তাকে কখনও আত্মা, কখনও ব্রহ্ম বলা হয়। আত্মাই একমাত্র বস্তু যা কখনও বাধিত হন না। সুতরাং আত্মা সত্য, পরব্রহ্ম। আত্মা নাই এমন কোন অভিজ্ঞতাই হতে পারে না। আত্মা নিত্য অনুবর্তমান বলে নিত্য প্রকাশমান। আত্মা বা চৈতন্য ব্রহ্ম—একথার অর্থ আত্মা বা চৈতন্য সৎ অর্থাৎ চরম ও পরম সত্তা।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২/১/৩) বলা হয়েছে—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।' অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান, অনন্ত। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। শঙ্করাচার্যের মতে, ব্রহ্ম স্বরূপত সৎ, চিৎ,

আনন্দ। অর্থাৎ সৎ, চিৎ, আনন্দই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কোন গুণ নাই। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। শঙ্করাচার্যের মতে, নিষ্প্রপঞ্চ বা নির্গুণ ব্রহ্মই উপনিষদের যথার্থ প্রতিপাদ্য। ব্রহ্ম অদ্বয়, নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরাকার, ভেদশূন্য অভেদ।

তিনি বলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ভাবরূপে প্রতিভাত সকল বিশেষ বিষয়েই ব্রহ্ম অনুবর্তমান ('সর্বং ঋল্বিদং ব্রহ্ম')। এ মতবাদ অদ্বৈতবাদ।

রামানুজের মতে, ব্রহ্ম চরম সত্য ও সত্তা। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের দুটি বিশেষণ। পূর্ণ, পরম সৎ ব্রহ্ম সগুণ। ব্রহ্মই ঈশ্বর। শঙ্করের মতে, নির্গুণ ব্রহ্ম পারমার্থিক সৎ, ঈশ্বর ব্যবহারিক সৎ। ঈশ্বর, জগৎ, জীবের পারমার্থিক সত্তা নাই।

রামানুজের মতে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা। কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন সত্তা নাই। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মে আশ্রিতরূপে সৎ। ব্রহ্ম অন্যনিরপেক্ষরূপে সৎ। সববস্তু ব্রহ্মের পরিণাম এবং ব্রহ্মের শরীর। ব্রহ্ম বিশেষ্য এবং চিৎ ও অচিৎ তাঁর বিশেষণ। ব্রহ্ম এই দুটি বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট হয়েও অন্যনিরপেক্ষ একমাত্র সৎ। এই মতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

রামানুজের মতে, ব্রহ্ম নির্গুণ নন, সগুণ। তিনি বলেন, ব্রহ্ম নির্গুণ—এই শ্রুতির অর্থ ব্রহ্মে হেয়গুণসমূহ (জরা, মরণ প্রভৃতি) নাই। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সমস্ত কল্যাণ গুণের আকর এবং হেয়গুণরহিত বলা হয়েছে। ব্রহ্ম অনন্ত কল্যাণ গুণাবলীর দ্বারা বিশেষিত। তাই ব্রহ্ম সগুণ। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই চরমসত্তা।

জগৎ
(The World)

জগতের সৃষ্টি কোথা হতে হল, জগৎ সৃষ্টির পর কোথায় থাকে, প্রলয়কালে জগৎ কোথায় যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩/১৪/১) বলা হয়েছে ঃ 'তজ্জলান্' অর্থাৎ "তৎ (ব্রহ্ম) হতে সবকিছু উৎপন্ন (জ), ব্রহ্মেই সবকিছুর স্থিতি (অন্), ব্রহ্মেই সব কিছুর লয় (লী) হয় (তৎ + জ + লী + অন্)।" বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে বলেছেন ঃ "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। অর্থাৎ "ব্রহ্ম হতে জগতের উৎপত্তি হয়েছে, ব্রহ্মে জগৎ অবস্থান করে এবং ব্রহ্মে জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়।" শঙ্করাচার্য বলেন, যথার্থ বিচারে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। তাই তিনি জগতের স্রষ্টা হতে পারেন না। মায়াশক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। জগৎ মিথ্যা। জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই। ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সৎ। মায়া বা অজ্ঞানের জন্য মিথ্যা জগৎ আমাদের কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়। শঙ্কর বলেন, রজ্জু-সর্প ভ্রমস্থলে রজ্জু সম্বন্ধীয় অজ্ঞানের দ্বারা রজ্জুর উপর সর্প অধ্যস্ত হয় এবং সর্পের ভ্রম হয়। ঠিক তেমনি ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। অজ্ঞান বা মায়া জগৎ ভ্রমের

কারণ। জগৎ নাই, কিন্তু মায়ার জন্য জগৎ আছে বলে মনে হয়। ব্রহ্ম সত্য হলেও জগৎ সত্য বলে প্রতিভাত হয়। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। ব্রহ্ম প্রকৃতই জগতে পরিণত হন না। ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতিভাত হন মাত্র। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, তাই জগৎ মিথ্যা। জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই। জগতের ব্যবহারিক সত্তা। ব্রহ্মজ্ঞান হলে জগৎ থাকে না।

রামানুজের মতে, সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জগতের কর্তা এবং উপাদান কারণ। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক। ঈশ্বরের দিক থেকে সৃষ্টি লীলারই প্রকাশ। জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম এবং ব্রহ্মের শরীর। তাঁর মতে, সৃষ্টি প্রক্রিয়া সত্য এবং সৃষ্ট জগৎও সত্য। কিন্তু জগতের ব্রহ্ম নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। জগৎ ব্রহ্মে আশ্রিতরূপে সৎ। সব বস্তুর মধ্যে আত্মারূপে ব্রহ্ম বর্তমান। "ব্রহ্ম হতে পৃথকরূপে অবস্থিত বস্তু নাই"—এটিই নানাত্ব নিষেধক উপনিষদের বাক্যসমূহের তাৎপর্য। উপনিষদসমূহ বস্তুসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের ব্রহ্ম সাপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করে।

জীব
(The individual soul)

'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—উপনিষদের এই প্রত্যেকটি মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় হল জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন—এটি আচার্য শঙ্করের মত। তিনি বলেন, আত্মা এক। এই আত্মাই ব্রহ্ম। অনাদি অজ্ঞান প্রসূত উপাধির জন্য এক আত্মা বহুরূপে প্রতিভাত হন। জীব আসলে ব্রহ্মই। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি উপনিষদের বাক্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদের কথাই বলা হয়েছে। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ব্যবহারিক। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকেই জীব ব্রহ্ম থেকে নিজেকে ভিন্ন মনে করে। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব মিথ্যা। ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। জীবাত্মা অজ্ঞান বা মায়ার সৃষ্টি। জীব ব্রহ্মস্বরূপ। জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।

রামানুজ বলেন, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি উপনিষদের বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের একান্ত অভেদের কথা বলা হয়নি। জীব ব্রহ্মের শরীর বা বিশেষণরূপে ব্রহ্মের সঙ্গে অপৃথকসিদ্ধি সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। তাই জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। কিন্তু অন্যদিক থেকে ব্রহ্ম বিভুচিৎ বা সর্ব্যব্যাপীচৈতন্য, জীব অণুচিৎ বা চৈতন্যের ক্ষুদ্রতম অংশ। ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ; ব্রহ্ম মায়াধীশ, জীব মায়াধীন। তাই রামানুজ বলেন, 'তত্ত্বমসি' বাক্যের দ্বারা জীব যে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হয়েও অভিন্ন একথাই বলা হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনের উৎসরূপে উপনিষদ

উপনিষদকে যথার্থভাবেই সমস্ত ভারতীয় দর্শনের উৎস বলা হয়ে থাকে। হিন্দু চিন্তায় এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ নাই, এমনকি অবৈদিক বৌদ্ধ মতবাদও, যা মূল

উপনিষদে পাওয়া যায় না। পরবর্তী সমস্ত ভারতীয় দর্শনই প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে তাদের মতবাদ উপনিষদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—এ থেকে উপনিষদের গুরুত্ব বোঝা যায়।

ব্রহ্মসূত্র যে উপনিষদের সুসম্বদ্ধ সংক্ষিপ্তসার—এ দাবি ব্রহ্মসূত্রকার করেন। বলা হয়, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষদ নিঃসৃত দুধ এবং তা বিশেষভাবে কঠোপনিষদ ও ঈশোপনিষদের দ্বারা প্রভাবিত। শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, বল্লভাচার্য প্রভৃতি সব বৈদান্তিকই দাবি করেন যে, তাঁদের মতবাদ উপনিষদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জৈন দার্শনিকদের কর্মবাদ উপনিষদ থেকে গৃহীত। অবৈদিক বৌদ্ধদের ভাববাদ, তত্ত্বসম্পর্কীয় মতবাদ, জাগতিক বস্তুর অনিত্যতাবাদ, জাগতিক বন্ধনের কারণরূপে অবিদ্যার স্বীকৃতি, সম্যকজ্ঞান নির্বাণ লাভের উপায়—এসবেরই মূল উপনিষদে নিহিত। সাংখ্য দার্শনিকদের প্রকৃতি সম্পর্কীয় মতবাদের উৎস শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ। তাঁদের জ্ঞান সম্পর্কীয় ধারণার উৎস ছান্দোগ্য উপনিষদ। সাংখ্য আত্মতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ক মতবাদ কঠোপনিষদ থেকে গৃহীত। যোগ-এর মূল নিহিত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে। ঈশোপনিষদে পাই জ্ঞান—কর্ম সমুচ্চয়বাদ। মীমাংসা দর্শন কর্মের উপর, বেদান্ত জ্ঞানের উপর, কেউ কেউ জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের উপর গুরুত্ব দেন।[৮]

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ভগবদ্‌গীতা বা সংক্ষেপে "গীতা কথাটির মানে ঈশ্বরের স্তবগান।"[৯] উপনিষদ এর উৎস। গীতা উপনিষদের সার। উপনিষদ যেন গাভী এবং গীতা সেই গাভী নিঃসৃত দুধ, যা দোহন করছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং যা পান করছেন শ্রীমান অর্জুন।

মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অংশ বিশেষ গীতা মহাভারতের মতই প্রাচীন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল খ্রিঃ পূঃ দশম শতাব্দী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে কৌরব পক্ষে আচার্য, গুরুজন ও অসংখ্য আত্মীয়বর্গকে উপস্থিত দেখে পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ অর্জুন বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে অস্ত্র ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। অর্জুন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। যুদ্ধ করা বা না করা—কোন্‌টি

---

৮. A Constructive Survey of Upanisadic Philosophy, R. D. Ranade, Quoted in A Critical Survey of Indian Philosophy, C. D. Sharma, 1976, pp. 30-31.

৯. হিন্দুধর্ম, ক্ষিতিমোহন সেন, আনন্দ পাঃ কলকাতা। ২০০৮, পৃঃ ৫০, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১, ইউ. কে.।

তাঁর কর্তব্য তা ঠিক করতে না পেরে অর্জুন বিষাদাচ্ছন্ন। তখন অর্জুনের সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কৌরব পাণ্ডবের ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য যে উপদেশাবলী দেন, তাই 'ভগবদ্‌গীতা' নামে খ্যাত।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন—'তুমি স্বরূপত সেই আত্মা। দেহাদি হতে ভিন্ন আত্মা নিত্য, অবিনাশী, দেহের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না। তুমি নিজ আত্মস্বরূপ ভুলে শোকগ্রস্ত হচ্ছ।' শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে বলেন—

"ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয়ি উপপদ্যতে"

—(ভগবদ্‌গীতা-২।৩)।

'হে অর্জুন, ক্লীবভাব আশ্রয় করিও না। তোমার এই ক্লীবতা সাজে না। তুমি এই দুর্বলতা পরিত্যাগ করে যুদ্ধার্থে উত্থিত হও।'

গীতার বক্তা "স্বয়ং জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর শ্রোতা শ্রীমান অর্জুন। লক্ষ্য অর্জুনের দুঃখমুক্তি। অর্জুনের দুঃখ ও দুঃখমুক্তি সর্বকালে সকল মানুষের দুঃখমুক্তি।"[১০]

আঠারটি অধ্যায়ে বিভক্ত ভগবদ্‌গীতা ধর্ম ও দর্শনের এক অসাধারণ গ্রন্থ। গীতার আঠারটি অধ্যায় হল ঃ (১) অর্জুনবিষাদযোগ ; (২) সাংখ্যযোগ ; (৩) কর্মযোগ ; (৪) জ্ঞানযোগ ; (৫) সন্ন্যাসযোগ ; (৬) ধ্যানযোগ বা অভ্যাসযোগ ; (৭) জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ; (৮) অক্ষরব্রহ্মযোগ ; (৯) রাজযোগ বা রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ ; (১০) বিভূতিযোগ ; (১১) বিশ্বরূপদর্শনযোগ ; (১২) ভক্তিযোগ ; (১৩) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ ; (১৪) গুণত্রয়বিভাগযোগ ; (১৫) পুরুষোত্তমযোগ ; (১৬) দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ ; (১৭) শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ ; (১৮) মোক্ষযোগ।

প্রচলিত গীতার শ্লোকসংখ্যা ৭০০। এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কথিত শ্লোক ৫৭৫, অর্জুন কথিত শ্লোক ৮৪, সঞ্জয়কথিত শ্লোক ৪০ এবং ধৃতরাষ্ট্র কথিত শ্লোক ১। "শঙ্করাচার্য হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি সকল ভাষ্যকার, টীকাকার ও ব্যাখ্যাকারই গীতার উক্ত শ্লোকসংখ্যা নির্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছেন।"[১১]

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা অবলম্বনে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গীতার ভাষ্য ও টীকাদির সংখ্যা বহু। গীতার ভাষ্যকার ও টীকাকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শঙ্করাচার্য, রামানুজ, নিম্বার্কাচার্য, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য, শ্রীচৈতন্য অনুগামী শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি। শ্রীমধুসূদন

---

১০. গীতা-ধ্যান (সমগ্র), ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ২০০৩, পৃঃ ২৮।

১১. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ (অনু), স্বামী জগদানন্দ (সং), উদ্বোধন, কলাকাতা ২০০৩, পৃঃ ৫৭-৫৮।

সরস্বতী, শ্রীধরস্বামী, মহর্ষি রমণ, যোগিবর শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী, স্বামী অভেদানন্দের গীতা ভাষ্যও সমাদৃত। গীতার প্রাপ্ত ভাষ্যগুলির মধ্যে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যই প্রাচীনতম।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় আত্মসাক্ষাৎকার বা মুক্তি লাভের উপায় রূপে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ আলোচিত হয়েছে।

"ত্যাগই গীতার বাণী। সকল কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগই গীতার বাণী। 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ'—একমাত্র ত্যাগের দ্বারা অনেকে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন—উপনিষদের এই মহতী বাণীই গীতায় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত।"[১২]

বালগঙ্গাধর তিলক এবং কোন কোন মনীষীর মতে, ভগবদ্‌গীতার প্রধান শিক্ষা কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্মের তত্ত্ব। কর্ম না করে কেউ ক্ষণকালও থাকতে পারে না। সকলেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়। কর্ম করতেই হবে। কর্মের প্রয়োজন আছে। কর্মহীন হলে দেহধারণও নির্বাহ হবে না। তবে কর্ম করতে হবে নিষ্কামভাবে। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বারবার বলেছেন—কর্ম ফল লাভের উপায় নয়, কর্মই লক্ষ্য। কর্তব্যবোধে কর্ম করতে হবে। কর্ম করার আগে বা কর্ম করার সময় কর্মফলের কথা চিন্তা করলে চলবে না। আক্ষরিক অর্থে 'কর্ম' শব্দ 'যা করা হয়' ('what is done') বা 'একটি কাজ'কে ('a deed') বোঝায়। আবার 'কর্ম' শব্দ দ্বারা বৈদিক বর্ণাশ্রম নির্দিষ্ট কর্ম ও যাগাদি কর্মকেও বোঝায়। গীতার মতে, কর্ম বলতে কর্ম মাত্রই বুঝতে হবে। গীতায় বলা হয়েছে—কেউ কর্মত্যাগ করতে পারে না এবং কর্মত্যাগ করলেই সিদ্ধি লাভ হয় না। অতএব কর্ম করতেই হবে। তবে যেভাবে কর্ম করলে কর্ম মঙ্গলকর হয়, শ্রেয় লাভে সহায়ক হয়, তাই করতে হবে। এর জন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের দ্বারা সংযত করে, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে হবে।

তাই ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২/৪৭) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন ঃ

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষুকদাচন।
মা কর্মফলহেতুঃ ভূঃ মা তে সঙ্গঃ অস্তু অকর্মণি।।"

অর্থাৎ "কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে। অতএব কর্ম কর। কিন্তু ফলের 'আকাঙ্ক্ষাই' যেন তোমার কর্মের হেতু না হয়। আবার কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।"

তাই ভগবদ্‌গীতাতে সমত্ব বুদ্ধিতে কর্ম সম্পাদনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কর্মজনিত সুখরূপ সিদ্ধি ও দুঃখরূপ অসিদ্ধি, লাভ-অলাভ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সমত্বভাব অবলম্বন করে সমত্ব বা নির্বিকার চিত্তে কর্মসম্পাদনই যোগ ("সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো

---

১২. পূর্ববৎ, পৃঃ ৬৬।

ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে''—ভগবদ্‌গীতা, ২/৪৮)। কর্মফলে আসক্তি বর্জন করে, সমত্ববুদ্ধি যুক্ত হয়ে কর্ম করার কৌশলই যোগ (''যোগঃ কর্মসু কৌশলম্—ভগবদ্‌গীতা, ২/৫০)। শ্রীমধুসূদন সরস্বতী তাঁর গীতার গূঢ়ার্থদীপিকা নামক টীকায় বলেছেন ঃ ''কর্ম করিতে হইবে। কর্মত্যাগ করিলে কখনও জ্ঞানলাভ যোগ্যতারূপ শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না। আবার ফলের জন্য কর্ম করিলেও শুদ্ধিলাভ হইবে না। তাই কর্ম করিতে হইবে, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগপূর্বক ; সাত্ত্বিক বুদ্ধি দ্বারা প্রেরিত হইলে এইরূপ কর্ম অনায়াসে সম্পাদিত হয়।''[১৩]

কর্মযোগের ব্যাখ্যায় ভগবদ্‌গীতায় কর্মত্যাগের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে কর্মফলত্যাগের কথা, কর্মফলে অনাসক্তির কথা। কর্মফলে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে কৃত কর্মই নিষ্কাম কর্ম বা কর্মযোগ। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? তা তখনই সম্ভব হবে যখন কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির 'আমি কর্তা' এই ভাব না থাকে। এই কর্তৃত্বভাব শূন্য হতে হলে ব্যক্তিকে যোগস্থ হয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরার্থে কর্ম করতে হবে। অর্থাৎ কর্মযোগী কর্মকে যজ্ঞে পরিণত করবেন (''যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়''—ভগবদ্‌গীতা, ২/৪৮)। স্বার্থচিন্তা না করে, কর্তৃত্বাভিমান ও অহঙ্কার শূন্য হয়ে, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য, জীবের কল্যাণের জন্য কৃত কর্মই যজ্ঞ। যজ্ঞের মধ্যে ত্যাগের মনোভাব নিহিত। যজ্ঞকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমিত্ব বা স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করতে হয়। এরূপ যজ্ঞবুদ্ধিতে কৃত কর্মই নিষ্কাম কর্ম। কর্মকে যখন যজ্ঞময় করে প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন কর্মী কর্মযোগী হন। ঈশ্বরের প্রীতির জন্য করলে সব কর্ম যজ্ঞে পরিণত হয়। ভগবদ্‌গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে (৩/৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন ঃ

''যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ অন্যত্র লোকঃ অয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।''

অর্থাৎ 'ঈশ্বর প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম ব্যতীত কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব তুমি ভগবানের উদ্দেশ্যে অনাসক্ত হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম কর।'' ভগবদ্‌গীতা কর্মপরিত্যাগ বা কর্মসন্ন্যাসের কথা বলে না, কিন্তু অনাসক্তভাবে কর্ম করতে বলে। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন ঃ 'অতএব সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং স্বীয় ক্ষাত্রধর্ম পালন হেতু যুদ্ধ কর' (''তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যচ''—ভগবদ্‌গীতা, ৮/৭)। যিনি সমত্ব বুদ্ধিরূপ যোগের দ্বারা সব কর্ম ভগবানে সমর্পণ করেছেন, যিনি জ্ঞানের দ্বারা সব সংশয় ছেদন করেছেন এবং যিনি আত্মবান তাঁর ক্ষেত্রে কর্ম

---

১৩. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমধুসূদন সরস্বতী গূঢ়ার্থ দীপিকা টীকার বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ২৪৫-২৪৬।

বন্ধনের কারণ হয় না। অতএব পূর্ণ জ্ঞানী হয়ে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। ভগবদ্‌গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে (৩/৩৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—কর্মযোগীকে ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করে তৃষ্ণারূপ কামকে পরিহার করতে হবে। কাম নাশের জন্য দেহাদি হতে পৃথক আত্মাকে আশ্রয় করতে হবে। আত্মজ্ঞানই তৃষ্ণারূপ কামকে বিনাশ করে। ভগবদ্‌গীতায় (৫/১১) বলা হয়েছে ঃ

"কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গংত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে।।"

অর্থাৎ 'নিষ্কাম কর্মযোগিগণ ফলাসক্তি বর্জনপূর্বক মমত্বভাব শূন্য ('আমার' এইভাব রহিত) হইয়া কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন।' আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন। অসংখ্য বাসনার দ্বারা কলুষিত চিত্তে আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না।

নিষ্কাম কর্ম মুক্তিলাভে সহায়ক হয়। তাই ভগবদ্‌গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে (৩/১৯) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন ঃ

"তস্মাৎ অসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হি আচরণ্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।"

অর্থাৎ 'অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্তব্য (নিত্য) কর্মের অনুষ্ঠান কর। কামনাশূন্য হইয়া কর্ম করিলে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবে।'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভগবদ্‌গীতায় আত্মসাক্ষাৎকার বা মুক্তি লাভের উপায় রূপে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ ও ভক্তিযোগের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্‌গীতার কোন কোন ভাষ্যকার কর্মযোগকে, কেউ কেউ জ্ঞানযোগকে, আবার অনেকে ভক্তিযোগকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু অনেকের মতে, ভগবদ্‌গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগের সমন্বয় দেখান হয়েছে। ভগবদ্‌গীতায় কখনও কর্মযোগের, কখনও জ্ঞানযোগের, আবার কখনও ভক্তিযোগের প্রশংসা করা হয়েছে। ভগবদ্‌গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের ২নং শ্লোকে কর্মযোগের প্রশংসা করে বলা হয়েছে—কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ই মুক্তিদায়ক হলেও কর্মসন্ন্যাস (জ্ঞানযোগ) অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান উৎকৃষ্টতর ("তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে")। ভগবদ্‌গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৮নং এবং চতুর্থ অধ্যায়ের ১৮-১৯নং শ্লোকে জ্ঞানের প্রশংসা করে বলা হয়েছে—'যিনি তত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ আমি আত্মা এরূপ জানেন, তিনি কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করেন' ("তত্ত্ববিত্তু.....নসজ্জতে"—৩/২৮)। বলা হয়েছে—'যাঁর শুভাশুভ কর্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তিনি প্রকৃত পণ্ডিত' ("জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ"—ভগবদ্‌গীতা-৪/১৯)। আবার ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬১নং শ্লোকে ভক্তির প্রশংসা করে বলা হয়েছে—"যিনি আমার অনন্য ভক্ত, তিনি সেই

সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করে আমাতে চিত্ত সমাহিত পূর্বক অবস্থান করেন'' (''তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ'')।

এভাবে দেখা যায় যে, ভগবদ্‌গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপিত হয়েছে। ভগবদ্‌গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৪নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

''ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।''

'যোগসাধনার দ্বারা ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করার পরই একজন ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি লাভ করেন। অর্থাৎ জ্ঞানের পর ভক্তির উদয় হয়।' আবার ভগবদ্‌গীতায় (১৮/৫৫) বলা হয়েছে ঃ

''ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।''

অর্থাৎ 'ভক্তি লাভের দ্বারাই ব্যক্তি পরমাত্মাকে জানেন এবং ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ ভক্তির পর জ্ঞানের উদয় হয়।'

অনাসক্ত হয়ে নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম করলে ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয় ও পরে নিখিল কর্ম জ্ঞানে পর্যবসিত হয়। ঠিকমত কর্ম করতে হলেই জ্ঞানী হতে হবে। জ্ঞানী হয়ে ভক্ত হতে হবে। ভক্ত হয়ে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে কর্ম করতে হবে। কর্মের যেটুকু দোষাবহ তা জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে গেলে কর্মীই জ্ঞানী হন।

জ্ঞানী 'সবকিছুতে বাসুদেব আছেন' (''বাসুদেবঃ সর্বম্'') এই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা হন ব্রহ্মভূত। কর্মের শেষ প্রান্ত নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি। জ্ঞানের শেষ প্রান্ত ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়া (ব্রহ্মভূত)। তখন ভক্তি দ্বারা দুটি পথ একীভূত হয়। ব্রহ্মভূত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে পরাভক্তি লাভ করেন (''মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্''—ভগবদ্‌গীতা ১৮/৫৪)।''[১৪]

অনেকের মতে, শ্রীভগবান গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের মধ্যে সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন করেও ভক্তিযোগেরই প্রাধান্য স্থাপন করেছেন। শ্রীমধুসূদন সরস্বতী গীতার **গূঢ়ার্থদীপিকা** নামক টীকায় গীতাকে তিনটি ষটকে ভাগ করে (প্রথম ছটি অধ্যায় কর্মযোগ, সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তিযোগ এবং শেষ ছটি অধ্যায়—ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত জ্ঞানযোগ) ভক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

''উভয়ানুগতা সা হি সর্ববিঘ্নাপনোদিনী।
কর্মমিশ্রা চ শুদ্ধা চ জ্ঞানমিশ্রা চ সা ত্রিধা।।''

---

১৪. গীতা-ধ্যান, ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, পৃ. ৪৩২।

আচার্য মধুসূদন ভক্তিযোগকে কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের মাঝখানে রেখেছেন এ কারণে যে, ভক্তি উভয়েতেই (কর্ম এবং জ্ঞানে) অনুগত। ভক্তির সঙ্গে কর্ম ও জ্ঞানের বিরোধ নাই। তাই ভক্তির তিনটি রূপ ঃ কর্মমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এবং শুদ্ধা ভক্তি।।[১৫]

গীতার শেষ কথা—প্রপত্তি বা শরণাগতি। গীতার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে এই শরণাগতির কথাই বলা হয়েছে। গীতার প্রারম্ভে আমরা এই শরণাগতির[১৬] কথা পাই। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে অর্জুন যখন তাঁর যথাযথ কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারছেন না তখন তাঁর শক্তিহীনতার উপলব্ধি হয়। তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেন—

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" (ভগবদ্‌গীতা, ২/৭)।

অর্থাৎ 'আমি শিষ্য, তুমি গুরু, আমাকে শাসন কর, শিক্ষা দাও, উপদেশ দাও। আমি তোমার শরণাগত'। এই শরণাগতির স্থলে আছে অর্জুনের আর্তি, ভক্তি। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দেন।

আবার গীতার নবম অধ্যায়ে আমরা শরণাগতির কথা পাই। শ্রীভগবানের শরণাগত হলেই কল্যাণ। শ্রীভগবানই 'প্রাণীর পরাগতি ও পরিপালক। ভগবানই সকলের আশ্রয়, সকলেরই শরণ, ও কল্যাণকারী' ("গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ"—ভগবদ্‌গীতা, ৯/১৮)।

গীতার নবম অধ্যায়ে (৯/২৭) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন ঃ

"যৎ করোষি যৎ অশ্নাসি যৎ জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।"

অর্থাৎ 'হে কৌন্তেয়, যে কোন কর্ম, আহার, হোম, দান, তপস্যা, যাহাই কর না কেন, তাহা আমাকে অর্পণ করিতেছ এরূপ বুদ্ধিতে কর।' এই শ্লোকে বলা হয়েছে—শ্রীভগবানের শরণাগতি এবং সমস্ত কর্মের ফল তাঁর চরণে সমর্পণ—এটিই গীতার শেষ কথা!

গীতার শেষে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—সকল প্রাণীগণের অন্তঃহৃদয়ে যিনি বাস করেন সেই ঈশ্বরের পাদপদ্মে শরণাগত হলেই পরমার্থ লাভ হয়। তাই ভগবদ্‌গীতায় (১৮/৬২) বলা হয়েছে ঃ

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।"

---

১৫. "উপনিষদে ভক্তিবাদ", গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, উদ্বোধন (১০০), শতাব্দী জয়ন্তী সংকলন, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ১৯৮-১৯৯।

১৬. শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, অনু, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, সম্পাদনা, স্বামীজগদানন্দ, পৃঃ ৩২।

অর্থাৎ 'হে অর্জুন, তুমি সর্বতোভাবে তাঁরই শরণ লও। তাঁর অনুগ্রহে পরম শান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।' সর্বতোভাবে ভগবানেরই শরণাগত হতে হবে। চিন্তা, বাক্য ও কর্মের দ্বারা সর্বতোভাবে তাঁরই শরণাগত হতে হবে। ভগবানের কাছে এই সর্বাঙ্গীণভাবে আত্মসমর্পণেই প্রসাদ পাওয়া যাবে। এই শরণাগতির কথাই বলা হয়েছে ভগবদ্‌গীতার (১৮/৬৫) এই শ্লোকে ঃ

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।"

এই শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ 'হে অর্জুন, তুমি মন্মনা হও। তোমার সমস্ত মনটা আমাকে অর্পণ কর। তবেই তুমি সর্বতোভাবে আমাকে লাভ করবে। আমার ভক্ত হও। আমিই প্রিয়তম বস্তু তা অনুভব কর। তুমি যা কিছু কর, সবই আমার প্রীতির জন্য কর। অহংকার ত্যাগ করে তুমি আমার পায়ে মাথা অবনত কর।'

ভগবদ্‌গীতায় (১৮/৬৬) বলা হয়েছে ঃ

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

অর্থাৎ 'সর্বধর্ম ('বর্ণধর্ম, আশ্রম ধর্ম ও সামান্য ধর্ম প্রভৃতি সকল প্রকার ধর্ম') পরিত্যাগ করে তুমি আমারই শরণাগত হও। আমার পাদপদ্মে শরণাগতি ছাড়া আর সব কিছুই পরিত্যাগ কর। সর্বধর্ম ত্যাগের ফলে কর্তব্য অকর্তব্য জনিত পাপ তোমার হবে না। তুমি আমাতেই বিশ্বাস রাখ, আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সকল পাপ হতে মুক্তি দেব। শোক করিও না।

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর **গীতা-ধ্যান** গ্রন্থে বলেছেন ঃ "অনন্যা ভক্তি দ্বারা আমাকে (ভগবানকে) আত্মনিবেদনে জীবন সমর্পণ ইহাই রাজবিদ্যা—রাজগুহ্যযোগ। সকল বিদ্যার রাজা হইল ভক্তি, আর সকল রহস্যময় ভজনের নিগূঢ় সংবাদ হইল 'প্রভু, আমি তোমার হইলাম বলিয়া পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ।' ...আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি ও পরমাত্মার আনন্দ স্বরূপের অনুভূতি লাভে অনন্যা ভক্তিই সর্বাধিক শক্তিশালী উপায়। এই অনন্যা ভক্তির মধ্যস্থতায় ভগবদ্‌গীতা কর্ম-জ্ঞানযোগের সমন্বয় ও ব্যবহারিক পারমার্থিক জীবনের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে।"[১৭]

ঈশ্বরে মন সমাহিত করলে, ঈশ্বরেই বুদ্ধি নিবিষ্ট করলে দেহান্তে ঈশ্বররূপে স্থিতি লাভ হবে তাতে সন্দেহ নাই (ভগবদ্‌গীতা ১২/৮)। ব্রহ্ম হওয়া বা ঈশ্বরে স্থিতি—এই উভয় লক্ষ্যই অধিগত হওয়া যায় মৃত্যুর পর (ভগবদ্‌গীতা ৮/৫)। আবার ইহ জীবনেই ব্রহ্মনির্বাণ বা মুক্তিলাভ হয় এরূপ উক্তিও ভগবদ্‌গীতায় পাওয়া যায়

---

১৭. গীতা-ধ্যান (সমগ্র), ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, পৃঃ ২৫৬।

(৫/২৫)। গীতার "মূল লক্ষ্য জীবকে জীবন্মুক্ত অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া। স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থাই সেই জীবন্মুক্ত অবস্থা।"

ভগবদ্‌গীতা অনুযায়ী মুক্তির অবস্থাতেও মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষ কর্ম থেকে বিরত হন না, যদিও তিনি সকাম কর্ম করেন না যা তাঁর অন্তর্নিহিত শান্তির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তখন তিনি অনাসক্ত হয়ে লোকসংগ্রহের জন্য অর্থাৎ মানুষকে অসৎ পথ হতে নিবৃত্ত করা এবং সৎপথে বা স্বধর্মে প্রবৃত্ত করার জন্য কর্ম করেন। ভগবদ্‌গীতায় এরূপ যোগীকে 'যোগারূঢ়' বলা হয়েছে। রাজর্ষি জনক, অশ্বপতি, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এভাবে সন্ন্যাসের ধারণা সকল প্রকার নিষ্ক্রিয়তা বিমুক্ত ধারণায় রূপান্তরিত হয়েছে। তাই বলা যায়, নিবৃত্তির এই রূপান্তরিত আদর্শের ধারণা হিন্দু চিন্তায় ভগবদ্‌গীতার এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

ঋত-এর ধারণা
[The Concept of Rta]

বৈদিক মানুষের নৈতিক জীবন দুটি মহান নীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। একটি হল—সামঞ্জস্যের নীতি (the principle of harmony), যাকে বলা হয়েছে 'ঋত'। অন্যটি হল—যজ্ঞের নীতি, যাকে বলা হয়েছে 'যজ্ঞ'।* ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩/১৭) সমগ্র জীবনকে একটি যজ্ঞ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তপঃ (তপস্যা), দান, আর্জব (সরলতা), সত্য বচনকে এই যজ্ঞের দক্ষিণা বলা হয়েছে।**

এটি বিশ্বাস করা হত যে, একটি সার্বিক নিয়ম ছিল যা কেবল সব জৈবিক ঘটনাসমূহই নয়, কিন্তু সব মানসিক অভিজ্ঞতাসমূহ ও তাদের নৈতিক পরিণামগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করত। বৈদিক মানুষের নৈতিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই ঋত-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে জীবনযাপন করা এবং তা করা হত যজ্ঞের মাধ্যমে।

আর্যদের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ বৈদিক ঋত (rta) শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। বেদ একটি মহান নীতি স্বীকার করে যা সমগ্র বিশ্বকে (cosmos) পরিচালিত করে। এই নীতি বা নিয়ম ঋত (rta) ও সত্য (truth)-এর নীতি। এই নীতির জন্যই

---

* "Swami Vivekananda's Contribution to Moral Philosophy—Ontological Ethics", Swami Bhajanananda, Swami Vivekananda—A Hundred Years Since Chicago, Ramkrishna Math and Ramkrishna Mission, 1994, pp. 565-566.

** "Hindu Ethics", The Upanishads, Swami Nikhilananda, Vol. II, p. 2.

বিশ্বজাগতিক ও নৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় এবং দেবতা, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি ও সমস্ত প্রাণী এই নিয়মের অধীন। বিশ্বজাগতিক ও নৈতিক শৃঙ্খলার ভিত্তিরূপে ঋত (Ṛta as cosmic and moral order) সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। ঋগ্বেদ-এ (১/১৫৬/৩) বলা হয়েছে ঃ "তমু স্তোতারঃ পূর্বং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভংজনুষা পিপর্তন।" অর্থাৎ "হে স্তোতৃগণ। প্রাচীন ঋত-এর গর্ভভূত বিষ্ণুকে যে-রূপ জান সেই রূপেই স্তোত্রাদির দ্বারা তাঁর প্রীতি সাধন কর।" এই মন্ত্রে বিষ্ণুকে ঋত-এর গর্ভ বলা হয়েছে। এখানে 'ঋত' মানে 'যজ্ঞ' বা 'নৈতিক শৃঙ্খলা'।

এখানে উল্লেখযোগ্য, প্রাচীন পারসীক ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক জরথুস্ট্র-এর (আনুমানিক ১০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ) দর্শনে আমরা একই শব্দ পাই যাকে 'অশ' ('asha') বলা হয়েছে। "Ṛta = areta = arta = arsha = asha, 'ঋত' শব্দের এই বিভিন্ন রূপান্তর আমরা পাই পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দ-আবেস্তায়। অশবহিস্ত জরথুস্ট্র স্বীকৃত সত্তা অহুরা মাজদার (Ahura-Mazda)*** অন্যতম গুণ। অগ্নিকে অশ-এর প্রতীক বলা হয়, কারণ অগ্নি তার সঙ্গে যুক্ত সবকিছুকে পরিবর্তিত করে এবং অগ্নিশিখা সতত ঊর্ধ্বমুখী। এজন্যই অশবহিস্ত পার্থিব ও স্বর্গীয় অগ্নির দেবতা।"[১৮]

প্রথমে ঋত শব্দের দ্বারা প্রকৃতির একরূপতা বা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর যেমন, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিনের আবির্ভাব, ব্যতিক্রমহীনভাবে নিয়মানুযায়ী সংঘটনকে বোঝাত, কিন্তু বেদের মন্ত্রভাগে ঋত শব্দের দ্বারা নৈতিক শৃঙ্খলাকেও (moral order) বোঝান হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বেদের দেবতাগণকে কেবলমাত্র বিশ্বজাগতিক শৃঙ্খলার রক্ষকরূপে না দেখে নৈতিক নিয়মের উদ্ভাবক রূপে দেখতে হবে। তাঁরা সৎ ব্যক্তির কাছে বন্ধুভাবাপন্ন এবং অসৎব্যক্তির কাছে শত্রুভাবাপন্ন। তাই তাঁদের অসন্তোষ পরিহারের জন্য মানুষের ন্যায়পরায়ণ হবার চেষ্টা না করে উপায় নাই।

বৈদিক দেবতা বরুণ-এর ধারণা থেকে স্পষ্ট হয় যে, বৈদিক দেবতারা বিশ্ব জাগতিক ও নৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সমানভাবে দায়িত্বশীল। বরুণ আকাশের দ্যোতক এবং স্বর্গীয় আলোকের দেবতা। তিনি যে বিশ্বজাগতিক নিয়মাবলী স্থির করেছেন তা কেউ লঙঘন করতে পারে না। তাঁরই শক্তির জন্য নদী সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, অথচ সমুদ্রের জলভাণ্ডার মাত্রাতারিক্ত বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু তাঁর কর্তৃত্ব শুধু ভৌতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, তা নৈতিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত এবং তাঁর নৈতিক

*** অহুরা মাজদা—এই বিশ্বের সকল মঙ্গলের প্রতীক।

১৮. 'Zorastrianism', Irach J. S. Taraporewala, The Cultural Heritage of India Vol. IV, The Ramkrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, 1969, pp. 536-39.

নিয়মাবলীও একইভাবে চিরন্তন ও অলঙ্ঘনীয়। এক্ষেত্রে ন্যূনতম বিচ্যুতিও তাঁর দৃষ্টির অগোচর থাকে না। তাঁর সর্বগ্রাহী সতর্ক দৃষ্টির কথা বোঝানর জন্য সূর্যকে কখনও কখনও তাঁর চক্ষু বলা হয়েছে।[১৯]

বৈদিক চিন্তায় এই ধারণা পাওয়া যায় যে , ঈশ্বরীয় তপস্যার ফলে প্রথম উৎপন্ন তত্ত্ব হল ঋত ও সত্য। ঋগ্বেদ-এ (১০/১৯০) বলা হয়েছে ঃ "ঋতং চ সত্যং চ অভীদ্ধ তপসোঽ ধ্যজায়ত।" অর্থাৎ "প্রজ্বলিত তপস্যা হতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্মগ্রহণ করল।" এর তাৎপর্য হল যে, বিশ্বজগতের আবির্ভাবের পূর্বে যেটি আবশ্যক তা হল সত্য কথন এবং আচরণ নির্ভর পারস্পরিক বিশ্বস্ততা। তৈত্তিরীয় উপনিষদ-এ (১/১/২২) বলা হয়েছে ঃ "ঋতং চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ।" অর্থাৎ "শাস্ত্রানুযায়ী ঋত বিষয়ক জ্ঞান, বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কর্তব্য।" 'ঋত' শব্দের অর্থ সত্য (truth), ন্যায়পরায়ণতা (right)। উপাসনার সার্থকতার জন্য জীবনে সত্য ও ন্যায় আচরণ কর্তব্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদ-এ (১/৪/১৪) বলা হয়েছে—ধর্ম ক্ষত্র বা শাসকশ্রেণীর চেয়েও বলশালী। ধর্মের চেয়ে মহত্তর কিছু নাই, কারণ একজন দুর্বল ধার্মিক ব্যক্তি কেবল শারীরিকভাবে শক্তিমান অন্য ব্যক্তিকে ধ্বংস করতে পারে। এই ধর্ম ও সত্য অভিন্ন। এই ধর্মের পূর্ববর্তীরূপে ঋগ্বেদে (১/৯০ এবং ৪/২৩) আমরা ঋত বা নৈতিক শৃঙ্খলার (Moral order) ধারণা পাই। অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে—"যা সত্য ও প্রিয় তাই বলা উচিত।" এটিই সনাতন ধর্ম। সত্য চিরকালীন। সমগ্র প্রাকৃতিক নিয়ম (ঋত) সত্যেরই প্রকাশ যা নির্ভুলভাবে ও ব্যতিক্রমহীনভাবে কাজ করে। ঋত বা সত্য সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ ও শৃঙ্খলার সহায়ক।

বেদে নিয়মের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে একথা মনে রাখা প্রয়োজন। কেননা ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধ ও জৈনদের কর্মের নিয়ম বৈদিক সাহিত্যে বিবৃত বিশ্বজাগতিক শৃঙ্খলার নিয়মের সঙ্গে যে সম্পর্কযুক্ত তা সহজেই দেখান যায়। কর্মবাদ বলে যে, কর্মের ফল বিনষ্ট হয় না। যে কর্ম করে তাকে ফল ভোগ করতে হবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। কর্মবাদ বলতে সমস্ত মানুষের জীবন ও ভৌতিক জগতের নিয়মকে বোঝান হয়। ঋগ্বেদ-এ এই নিয়মকে 'ঋত', মীমাংসা দর্শনে 'অপূর্ব', ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে 'অদৃষ্ট' বলা হয়েছে। কঠোপনিষদ-এ (১/৩/১) বলা হয়েছে—"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে।" জগতে প্রকাশমান পরমেশ্বরের ক্রিয়াই সুকৃত। এর ফল আনন্দকে এস্থলে ঋত বলা হয়েছে। পরমেশ্বর আনন্দের ভোক্তা এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকলে

---

১৯. Outlines of Indian Philosophy, M. Hiriyanna, 1968 (1st pub. London, 1932), pp. 33-34.